উল্টো কথা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

উল্টো কথা

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্;
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীচরণেষু—

সোজা কথা বলিলে সবাই উল্টো বোঝে, তাই, উল্টো কথা বলিলাম যদি কেহ সোজা বোঝে। ভগবান উল্টো-সোজা দুয়েরই শ্রোতা এবং বিধাতা—তাই এ পাগলের প্রলাপ আপনাকে শুনাইবার দুঃসাহস হইল। ইতি—

সেবক হেমন্ত।

মুখবন্ধ

উল্টো কথা—সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা, ভাষা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ। নারায়ণ, যমুনা, উপাসনা, মোসলেম ভারত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় গত ২।১ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি—

আশ্বিন, ১৩২৮
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

সূচীপত্র

ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের পুস্তকাবলী :—

১। **স্বদেশরেণু**—(চতুর্থ সংস্করণ)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।•

এই পুস্তকখানিতে শিশুদিগের উপযোগী কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক ছড়া আছে। "জুজু-বুড়ী" ও "ছেলে-ধরা" প্রভৃতি যে সব শিশুপাঠ্য ছড়ার আজকাল বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই কবিতাগুলি যে ছোট ছেলে-মেয়েদের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিবে ও তাহাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিবে, ইহা নিশ্চিত। বঙ্গদেশে প্রত্যেক মায়ের কাছে এই পুস্তক এক একখানি থাকা উচিত।

২। **পল্লীব্যথা**—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এই কবিতাগুলিতে পল্লীজীবনের দুঃখময় করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বাংলার অন্তরতম প্রদেশের দুঃখ দৈন্য বেদনাকে এমন ভাবে আর কেহ চোখের জলে ফুটাইতে পারেন নাই।"

৩। **ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন**—(সচিত্র) মূল্য ৸৹ আনা।

সুকুমাররঞ্জন দাশ প্রণীত। চিত্তরঞ্জনের যে কয়খানি জীবনী এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশ্বস্ত জীবনী।

৪। **শ্রীঅরবিন্দ** (সচিত্র)

অরবিন্দ ঘোষের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত

অতি অল্প লোকেই জানেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী খানি সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

৫। বিশ্বভারত—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
"বিশ্বসভ্যতায় ভারতের বাণী"—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৬। স্বরাজ ও খলিফত (সচিত্র)—বীরেন্দ্রনাথ সেন ।৴০
"স্বরাজ" "খলিফত" প্রভৃতি বলিলে কি বুঝায়, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা বাংলাদেশের অনেকেরই নাই। লেখক এই বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সাধারণকে বুঝাইতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

৭। ছায়াবাজি—হেমন্তকুমার সরকার ॥০
(নতুন ধরণের গল্পের বই।)

৮। পষ্ট কথা—হেমন্তকুমার সরকার ।৶০
(ভাষা, শিক্ষা সাহিত্য, শিল্প, সমালোচনা-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ।)

৯। যুগ-শঙ্খ—হেমন্তকুমার সরকার ৵০
(যুগোপযোগী প্রবন্ধ।)

১০। **Non-co-operation**—B. C. Pal As. 8

১১। A **Message of Hope**—P. K. Sarker •5•
—Being an explanation of Prabhu Jagatbondhu's mission.

১২। লেনিন ।০

১৩। নানা চিন্তা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৲

১৪। প্রবন্ধমালা ঐ ১॥০

১৫। কাব্যমালা ঐ ১॥০

উল্টো কথা

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্য

শুনিয়াছি বড় মামা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া মেডেল পাইলে চারি পাশের গাঁয়ের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। বাংলায় এমন একটা দিন যে ছিল আজকালকার আপিসে আপিসে তাড়া-খাওয়া গ্রাজুয়েটের দল বোধ হয় স্বপ্নেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম গ্র্যাজুয়েট হইয়া বাংলার ভবিষ্যৎ দুঃখের পথ উন্মুক্ত করেন—তখন নাকি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ পড়িয়াছিল। আজ বাংলা দেশে গ্র্যাজুয়েট দলে দলে বাহির হইতেছে—অথচ একটাও তোপ পড়িল না দেখিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে বকেয়া তোপগুলি একসঙ্গে দাগিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পাশ হইলে গাঁয়ের লোক জড় হওয়া বা গ্র্যাজুয়েট হইলে তোপ পড়ার যুগ আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও যায় নাই। নিরস্ত পাদপের দেশে এরণ্ডও দ্রুম বলিয়া গণ্য হয়, আমাদের

সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের দেশে সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর ছড়াছড়ি—সবাই যদি সম্রাট হয়, তবে পদাতিক বা কে, আর প্রজাই বা কে? বাংলাদেশের রাজ্যবিহীন রাজা মহারাজার ন্যায় এই সকল সম্রাটকে সকল সময়েই ঋণের পিরামিডের মাথায় বসিয়া উঁচু হইতে হয়। সুখের বিষয় দেশের লোক জানে না—তাঁহারা কোথা হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন, অবশ্য তাঁহারাও বুদ্ধিমানের মত স্বীকার করেন না—কোন্ ধনাগার হইতে এই সম্পদ ধার করিয়া লইয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্য-সেবার প্রাইজ পশ্চিমের সরস্বতী টাকা হিসাবে বেশ মোটা কিছুই দিয়াছেন—দরিদ্রের জাতি, অত গুলি টাকা এক জায়গায় দেখিয়া আনন্দে আমাদের পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক দেশে মাত্র একজন ব্যারিষ্টার ছিল—পাড়াগাঁ হইতে লোক আসিয়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত;—কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে আসিলে এই প্রশংসমান পল্লীবাসীদের বিস্ময়-সূচক হাঁ-টা বোধ হয় এত বিস্তৃত হইত যে তাহাতে বঙ্গ ভঙ্গের মত মুখে একটা compound fracture হইয়া তাহাদের বাঁচিবার কোনো সম্ভাবনাই থাকিত না।

"তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

আমাদের দেশের সাহিত্য বলিয়া তাহাকে আদর করি, প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহার সেবা করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের আসল ব্যাপারটা কি তাহাও হুঁস থাকা দরকার। সে খেয়াল না থাকিলে ক্রমজীবনে এরণ্ড হইয়াই কাটাইতে হইবে। আমরা চোখ বুঁজিয়া এই

ভাবিয়া বসিয়া আছি যে, ভারতের মধ্যে আমরাই অগ্রসর জাতি—ভারতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সাহিত্য-গুরু আমরা। কিন্তু প্রদীপের নীচে কতটা অন্ধকার সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের দীপটি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, হিন্দুস্থানী জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে দীপালি উৎসবের আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে—আমরা আমাদের অচলায়তনের কোণে শিবরাত্রির সলিতাটি লইয়াই বসিয়া আছি।

বিশ্বসাহিত্যে আমরা কি দিয়াছি? রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কোন্ সাহিত্যরথী, বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছেন? আমাদের সাহিত্য-সম্রাটগণ সবই 'স্বদেশে পূজ্যতে';—'সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এমন সাহিত্যিক চাই, যিনি বিশ্বমানবের মর্ম্মের অন্তস্তম স্থলটিতে আঘাত করিয়া বাঙালীর নিজস্ব সুরটিকে জগতের করিয়া দিবেন। বাংলার সে সেক্‌স্‌পীয়র, গেটে, টল্‌ষ্টয় এখনো তো আসিল না!

আমাদের নিজের প্রাণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই। তাই ঠিক সুরটি ধ্বনিত হইতেছে না। কি একটা বেসুরো অবাস্তবতায় আমাদের সাহিত্য মূক হইয়া রহিয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাংলার মুদীর দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানও রামায়ণের রচনায় কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের একতার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র যে সাহিত্যে, সে ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী রামপ্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা মাঠ প্লাবিয়া রাখালের গলায় ধ্বনিত হয়, আবার কর্ম্মরত গৃহস্থের ব্যস্ত-জীবনের মাঝে বৈরাগীর খোল করতাল, বাউল ফকিরের একতারার সঙ্গে আসিয়া খানিকক্ষণের জন্য জীবনের দুর

লক্ষ্যের আবছায়া চিত্রটা মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে আমাদের সে সাহিত্য কই ?

ইংরেজী ভাবে তৈরী, ইংরেজী সভ্যতার by-productদের জন্য একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা ধনীর গৃহে শূন্যে ঝোলানো সুন্দর আগাছার মতই শোভা পাইতেছে। দেশের মাটীতে তাহার শিকড় নাই—তাহার মাথাটা নীচের দিকে আর গোড়াটা উপরে। মালীর জলদানে তাহার পুষ্টি ; ভানুর পবিত্র কিরণ ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া তাহার গায়ে কালেভদ্রে লাগে—বাহিরের উন্মুক্ত হাওয়া পর্দার ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহাকে কখনো কখনো দোলায়—আকাশের বৃষ্টি হয় তো কোনো দিন অসাবধানতায় খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার গায়ে ছাট দেয়—নিশার শিশির তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই নিরস্ত হয়, প্রকৃতি সে মণির মত উজ্জ্বল ঢলঢল অলঙ্কার তাহার মাথায় পরায় না--আমাদের সাহিত্যের আজ এই অবস্থা !

সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই।

ধর্ম্মের ন্যায়, স্মৃতির ন্যায়, বিদ্যার ন্যায় সাহিত্যেরও একটা শিক্ষা দিবার কাজ আছে। The object of writing a story is story-writing—গল্পলেখার সার্থকতা গল্পলেখাতেই, এ সব কথা paradoxএর জন্য শুনিতে ভাল এবং বলাও বোধ হয় সেই কারণেই হয়। কিন্তু চরমে সাহিত্যের একটা উদ্দেশ্য তো আছে। সাহিত্যিকের নিকট সাহিত্য সৃষ্টি শুধু ঘুম পাওয়ার মত, ক্ষিদে পাওয়ার মত—একটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাহার ভিতর আর্ট আছে, চেষ্টা আছে, ভাব আছে। থিয়েটারের ষ্টেজে দাঁড়াইয়া অভিনেতা যেমন দর্শকগুলিকে

সামনে রাখিয়া অভিনয় করেন, সাহিত্যিকও পাঠকবর্গের হাততালির দিকে কাণ খাড়া রাখিয়া লিখিয়া থাকেন। সোণালি উষায় গলা ফুলাইয়া স্ফুর্ত্তির জ্বালায় পাগল দোয়েলের মত আপন মনে গান করিবারই যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শাহারার মরুস্থানে কিম্বা আমেরিকার জঙ্গলে সাহিত্যিকদিগের জন্য একটা (penal settlement) বন্দী উপনিবেশ করিলেই ভাল হয়। লিখিয়া ছাপানই বা কেন? আর বিজ্ঞাপন দেওয়াই বা কেন? তাই সাহিত্য শুধু subjective বা অন্তরের নয়, সে একটা বহির্জগৎ বা object এর নিকট তাহার সার্থকতা পাইতে চায়। কবি নিজে কবিতা লিখিলেই তৃপ্ত হন না—জগৎকে শুনাইয়া তৃপ্ত হইতে চান। জগৎকে যখন শুনাইতে চান—তখন জগৎ কি চায়, সেটাও একটু মনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে বই কি।

অবশ্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল পাত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক বিশ্বমানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলিকে অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবে। তাহার সৃষ্ট চরিত্র হয় তো স্মৃতিশাস্ত্র বা সমাজের আইন মাফিক না হইতে পারে। না হওয়াই স্বাভাবিক, মানুষের জন্মটাও তাহাকে পরামর্শ করিয়া হয় নাই, তাহার জীবনটাও লজিকের যুক্তি অনুসারে চলে না। সে মানুষ—একটা আস্ত জ্যান্ত জানোয়ার এবং লজিকের syllogism নয় বলিয়াই—তাহার জীবনটা এই একটা পাগলের খেয়ালের মত, রহস্যের মত হইয়া চলিয়াছে। এই রহস্যের অন্তরালে উঁকি মারিতে গিয়া বিফল চেষ্টায় যে সৌন্দর্য্যরসের অবতারণা—তাহাই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আমাদের সাহিত্যে এই সকলের কথা খুব কমই আছে। নাটক, নভেল এবং কবিতার ভরে বাংলা সাহিত্য যায় যায় হইয়াছে। নাটকের

চরিত্রগুলি যেমন অস্বাভাবিক, অভিনয়ও তদ্রূপ। যে নায়কের চরিত্র ভাল সে একবারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত—ভাজা মাছখানি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া খাইতে জানে না—আবার যাহার চরিত্র খারাপ সে একেবারেই সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। যেন স্মৃতিশাস্ত্র মাফিক স্বর্গ নরকের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃষভের মত সুর হইলেই বীররস হইল, আর নাকি-সুরে প্যাঁ প্যাঁ করিতে পারিলেই করুণ রস—আর কাতুকুতু দিয়া কোন গতিকে হাস্যরস জাগাইতে পারিলেই, শ্রেষ্ঠ নাটককার!

একটা মেস, একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী ও লম্পট একটা ছোকরাই আমাদের নভেলগুলির পুঁজি। বেদেরা যেমন একটা ভাল্লুক, একটা রামছাগল, আর একটা মর্কট লইয়া বাজী দেখাইয়া পয়সা উপায় করে—আমাদের নভেল লেখাও কতকটা সেই ধরণের। এতদিন কলিকাতার মেসে থাকিতাম—ঠাকুর চাকরের আদর যত্নে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইবার উপক্রম করিল—কিন্তু পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন "লভ্" করিবার সুযোগ পাইয়া এ নীরস জীবনটা সরস হইতে পাইল না তো! আমাদের সমাজশাসিত বৈচিত্র্যহীন জীবনে 'লভের' অবসর নাই, তাই কলিকাতায় আনিয়া মেসে ফেলিয়া লভ্ ঘটাইতে হইবে-ই—না হইলে plot খাড়া হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যে সকল সমস্যা জীবন্ত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে—বার্নার্ডশ্ বা হাউপ্টমান প্রভৃতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সকল সমস্যার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনে কোর্টসিপ নাই, elopement নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাই, সধবা বিবাহও নাই, divorce নাই, যুদ্ধ নাই, রাজ্য নাই,—সমাজ বিপ্লব নাই—কি

লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম—সে আর কত রকমে লেখা যাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধার করা আইডিয়া লইতে হয়—কিন্তু বাঙ্লার মাটিতে সেগুলি নিতান্ত আগাছার মতই রহিয়া যাইতেছে।

জাতীয় জীবনের—সমাজ জীবনের প্রসার না হইলে, চঞ্চলতা না আসিলে, সমস্যা দেখা দিবে না সমস্যা না আসিলে যুগ-সাহিত্যের আবির্ভাব হইবে না।

কবিতার ভিতর দিয়া আমাদের সাহিত্য ফুটে নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই পশ্চিমের পাকা শিষ্য। মিল্টন, বায়রণ, শেলি প্রভৃতির ভূত এই সকল লেখার পিছন হইতে উঁকি মারে। Sublime conception আমাদের সাহিত্যে নাই। Lyric genius বা গীতি-কবিত্ব আমাদের আছে বটে কিন্তু অনেক স্থলেই হরিনাম ফোড়ন দিয়া টপ্পা গাহিয়া আমরা সে গীতি-প্রতিভা নিঃশেষ করিয়াছি। রাধা কৃষ্ণ না জন্মাইলে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন কবির পেশা উঠিয়া যাইত।

"সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি।"

আমাদের কবিতার সম্বল এই কয়টি। আমাদের জাতের চরিত্র যেমন হালকা, সাহিত্যও তেমনি হালকা। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন ইহা কাঁচা বয়সের লক্ষণ—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ইহা ইঁচোড়ে পাকার লক্ষণ। এই কাঁচা অবস্থায় পাকা বন্ধ করিতে হইবে। বাঙ্লার সাহিত্য-প্রতিভা চিরন্তন শাশ্বত রসের অনুগামী সাহিত্যের সৃষ্টি করুক। তৃষ্ণাতুর পথিককে শুধু এক গেলাস ঘোলের সরবৎ না দিয়া

তাহাকে স্বর্গের অমৃতবারি দানে তৃপ্ত করুক। দু'দিনের কথা ভুলিয়া চিরসত্য, বিশ্বজননীকে অবলম্বন করিয়া মানব-জীবনের এবং জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হোক—তবেই আমাদের সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য নামের যোগ্য হইবে, জগতের নিকট আমাদের মা আদৃত হইবেন, বিজয়ের বরমাল্যে বিভূষিত হইয়া আবার আমরা অমৃতের অধিকারী হইব।

আর্টের সমজ্‌দারি

আমাদের দেশে আর্টের চর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ভদ্রলোকের গৃহ এবং ইস্কুল-কলেজ হইতে কলাবিদ্যা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সেকালে এই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করা শিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা নায়ক নায়িকার কলাকুশলতার বহুস্থলে পরিচয় পাই। সুখের বিষয় এখন আবার কলাবিদ্যার চর্চ্চা কিছু কিছু আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে না কি কলা বিদ্যা প্রবেশ লাভ করিয়াছে—কিন্তু ভয় হয় সেটা কলা বিদ্যার শুদ্ধ সংস্করণ "কদলী বিদ্যা"য় পরিণত না হয়!

নিজে কলাবিদ্যা কুশল না হইলেও কলা বিদ্যার সমজ্‌দার হওয়াটাও বিশেষ দরকার। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত তাঁহারা অন্যদিকে যতই শিখুন না কেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মত গোমূর্খ কমই পাওয়া যায়। Æsthetics নামক জিনিষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই।

আমাদের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশে কোনোখানেই জাতীয় আর্টের আদর নাই। বিদেশী আর্টের ঝুটা আমদানীতে আমাদের ঘরবাড়ী ছাইয়া গিয়াছে এবং একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই সকল নকলের অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়িবে।

সরু সরু গলি নর্দ্দমার গন্ধে পূর্ণ, দরজা জানালাহীনগৃহ ইহা লইয়াই আমাদের ভারতীয় নগর৷ কিন্তু চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলে আমরা নগর বিন্যাসের কেমন সুন্দর পরিকল্পনা পাই। আমরা বাড়ী তৈরি করি—সে কোন্ আর্ট অনুসারে

জানি না—ভারতীয় কলার নিদর্শন মাত্র তাহাতে থাকে না। আমাদের ঘর বাড়ী ইঙ্গবঙ্গ এমন এক ফ্যাসানে প্রস্তুত হয় যাহার মধ্যে আর্টের 'আ'ও খুজিয়া পাওয়া ভার।

কেবল আমাদের মন্দির মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণে খানিকটা প্রাচীনভাব বজায় আছে। তবে মন্দিরের ভিতরকার ঠাকুরের উপর আজকাল অনেক রকম আর্ট চলিতেছে এবং মন্দিরের সাজসজ্জা আসবাবের মধ্যে বিলাতী জিনিসেরই প্রাধান্য হইতেছে। ইহার ভিতর অজ্ঞাতসারে যেখানে প্রাচীন আর্ট থাকিতেছে—সেখানেই সে কোনো প্রকারে বাঁচিয়া আছে।

আমাদের ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জার ভিতর ভারতীয় আর্টের কিছু মাত্র নাই। ছবিগুলি কেবল রং ঢালা, পোষাকপরিচ্ছদ সাহেবী পোষাকের বটতলা সংস্করণ মাত্র। আমাদের দেশের বড়লোকের বাড়ীর বাহিরে বিদেশী ঢঙের ন্যাংটা ষ্ট্যাচুর মেলা এবং ঘরের ভিতর ন্যাংটা মেমসাহেবের ছবির গুঁতো গুঁতি। কোচ, সোফা প্রভৃতিতে ঘর জোড়া। আমাদের সনাতন ফরাস আর তাকিয়া আজ কোথায় নির্ব্বাসিত! পোষাক পরিচ্ছদের তো কথাই নাই। বাপ মা পূজার সময় ছেলেকে একটি সাহেবী পোষাক কিনিয়া দিতে পারিলে ধন্য হন। যে সাহেবী পোষাক পরে না, তাহার পয়সার অভাব বুঝিতে হইবে। এই পোষাকের মধ্যে আর্ট নাই এমন কথা বলি না—কিন্তু তাহা বিদেশী এবং আমরা অনুকরণ করিতে যাইয়া সে আর্টের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া থাকি।

তারপর সূক্ষ্ম কলার কথা ধরা যাক। নৃত্য বিদ্যার বাস তো গণিকালয়েই হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে যে নাচিতে পারে এবং সেই নাচের ভিতর আবার একটা আর্ট থাকিতে পারে—ইহা আমাদের কল্পনারও অতীত। অথচ এই অসম্ভব ব্যাপারটা আজও

সাহেবদের ঘরে দুবেলা ঘটিতেছে এবং আমাদের দেশেও এককালে ঘটিত। ভদ্রলোকের সামনে নাচিতে পারে এমন দুঃসাহস যাত্রাদলের ছোকরা ভিন্ন এবং মেয়েদের মধ্যে থিয়েটারের গণিকা ভিন্ন আর কাহারও নাই।

তার পর সঙ্গীত। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে গান করিতে জানা—হয় খৃষ্টানী না হয় ব্রাহ্ময়ানীর লক্ষণ। দুঃখক্লান্তি-পীড়িত বাঙালী-জীবনে আনন্দের ফোয়ারা যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর পুত্র কন্যাদের মধুর সঙ্গীতালাপে গৃহখানি ভরপুর করিয়া আনন্দের স্রোত বহানো আজকাল যেন একটা ভীষণ অসম্ভবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। টপ্পা খেউড় প্রভৃতি হাল্‌কা সুরের গান হয়তো আমরা কিছু জানি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের ধ্রুপদ খেয়াল এখন কেবল কালোয়াতের আসরে শ্রোতার হাঁই তোলায় মাত্র।

আর্টের সমজ্‌দারি চাই। গান শুনিলেই হয় না—গান বুঝিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা চাই। সকল চারুকলার বিষয়েই এই কথা খাটে। আমরা গানের কথাগুলি শুনিয়া গান বুঝিতে চাই। এ যেন গল্প শোনা। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর ষ্টাইলের কথা বলিতে গিয়া ইহাকে কালোয়াতী গানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। "চলতো রাজকুমারী" বলিয়া ওস্তাদ গান ধরিলেন, নানাভাবে নানাভঙ্গে ঐ একই কথা কতবার ফিরিয়া ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—সমজ্‌দার শ্রোতা রসে ভরপুর হইয়া বাহবা দিতে লাগিল, আর যাহারা রাজকুমারীর আধ ঘণ্টার মধ্যেও কোথায় যাওয়া হইল জানিতে পারিলেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই একে একে বিরক্ত হইয়া আসর পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গীত যখন উচ্চ অঙ্গে যায় তখন রূপ ছাড়িয়া সে ভাবের মাঝারে নিজকে বিসর্জ্জন করিয়া ফেলে। তখন

সমজ্‌দারের কাণে কেবল সুরটাই ঘোরে—কথা কোথায় চলিয়া যায়। শেষে হয়তো শুধু শব্দবিহীন সাধাসুরের উপরই সমস্ত সঙ্গীতটি ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। তাল মান লয় ঠিক থাকিলেই হইল—রাগ রাগিণীর সৌন্দর্য্যেই প্রকৃত সমজ্‌দার তখন আত্মহারা।

কবিতাতেও এইরূপ আকারটা অবলম্বন মাত্র। সেক্‌স্‌পিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওয়াণ্ট হুইট্‌ম্যান প্রভৃতির ভিতর হয় তো কথার রিনিঝিনি বেশী নাই কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য্যে, চিত্রণের বৈচিত্র্যে এত বড় সৃষ্টি কবিতারাজ্যে আর কাহার আছে? কেবল কথার মারপ্যাচ এবং কতকগুলি শ্রুতিমধুর শব্দের উল্টোপাল্টা সংযোগেই কবিতা হয় না। অবশ্য সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করাও আর্টের একটা দিক। কালিদাস, টেনিস্‌ন, সুইন্‌বার্ণ, রবীন্দ্রনাথে এই আকার ও ভাবগত আর্টের বেশ সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু আকারটাই কবিতার সর্ব্বস্ব নয়। ঐটিকে আশ্রয় করিয়া কবিতার প্রাণ অন্তর্নিহিত থাকে। a^2+b^2+2ab এই ফরমুলায় কি মজা আছে যে শুধু a, b পড়িয়াছে সে বুঝিবে না—তাহাকে গণিতজ্ঞ হইতে হইবে। তাই শব্দ জানিলেই, ভাষার আকারের সহিত পরিচিত হইলেই কবিতা বোঝা যাইবে না—ভাবের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তবেই প্রকৃত সমজ্‌দার হইতে পারা যাইবে।

চিত্রেও তাই। ছবির বহিরাকৃতি নিখুঁত হইলেই আর্ট হইল না। তাহার জন্য তো ফটোগ্রাফ আছে। আর্ট কোথায়—ভাবের ব্যঞ্জনাতেই তো আর্ট। র‍্যাফেল অথবা লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি আজ যে অমর, সে কেবল গোটা কতক মানুষের চেহারা আঁকিয়া নয়, মানব প্রকৃতির মূল্যবান কয়েকটি ভাবের দ্যোতনাকে তাঁহারা অমর করিয়া গিয়াছেন।

মায়ের অনন্ত স্নেহ ম্যাদোনার ছবিখানিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ভাব হিসাবে যে জিনিস মানব-জীবনে যতখানি বড় স্থান অধিকার করে, ছবিখানিও ততটা বড় স্থান আর্টে পাইবে। মনে করা যাক—একদল কুকুর একটি শেয়ালকে মুরগী চুরির সময়ে অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়াছে—মুরগী, শেয়াল এবং কুকুরের সেই অবস্থায় যে ভাবটি হয় ঠিক সেই ভাবটি চিত্রকর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা বলিব ছবিখানি বেশ হইয়াছে। কিন্তু আর একচিত্রে দেখি মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাট্ সাজাহান আগ্রা দুর্গ হইতে একবার জনমের মত প্রিয় মমতাজের সমাধি দেখিয়া লইতেছেন—আর্ট হিসাবে এই ভাবের চিত্রের স্থান মানুষের জীবনে ঢের উঁচুতে। হয় তো শাজাহানের হাত পা ঠিক আঁকা হয় নাই—হয় তো তাজমহলের ছবিখানি তত স্পষ্ট বা নিখুঁত হয় নাই—কিন্তু ভাব-সম্পদে এই সুন্দর চিত্রখানি স্রষ্টাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এক গেলাস ঘোলের সরবৎ খাইয়া কি আমোদ হয় একজন কবি খুব চমৎকার ছন্দে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রকে নিজের শেষ পয়সাটি দান করিলে কি সুখ হয় আর একজন কবি তাহা হয় তো নিকৃষ্ট ছন্দে কিন্তু ভাবের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—আমরা ভাবসম্পদের জন্য শেষোক্ত কবির নিকটই মাথা নত করিব।

অনেক সময় আমরা নিজদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অথবা অভ্যাসের দাস বলিয়া ভাল জিনিসকেও অবহেলা করি। যেমন ভারতীয় চিত্রকলা বলিতেই আমরা নাক সিটকাইয়া উঠি। জিনিসটা কি তাহা হয় তো একদিনও বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। ভারতীয় দর্শন কি, একদিনও বুঝিলাম না—অথচ ভারতীয় দর্শনের কথা উঠিলেই গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিব—এ যে বড় অন্যায়। ভারতীয় চিত্রকলা

বুঝিতে হইলে ভক্তির ভাব লইয়া কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যতার এক একটি স্বতন্ত্র আদর্শ আছে। ভারতের তথা প্রাচ্যের আদর্শ অন্তর্মুখীন—পাশ্চাত্যের আদর্শ বহির্মুখীন। গ্রীক এবং রোমান আর্টের ভিতর চেহারার খুঁত পাওয়া যাইবে না। তাহার ভিতর অবাস্তবতা থাকিলেও তাহা বাহিরের আকৃতি হিসাবে নিখুঁত হইয়া ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সমগ্রের সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবে। মনে করুন একটি নিখুঁত মানবের ছবি—যেমন সুন্দর চোখমুখ, তেমনি হাত পা, তেমনি সব—কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ নাই, পূর্ণতায় যেন চারিদিকের সৌন্দর্য্য ভরিয়া উঠিয়াছে। এখানে অবাস্তবতা এই যে এরূপ মানব আমরা সংসারে পাই না—সকলেরই কিছু না কিছু খুঁত আছে কিন্তু এ মানুষটি ঠিক যেটি হইলে আমরা সন্তুষ্ট হই তাই। এই realistic idealism পাশ্চাত্যের আদর্শ। ভারতের আদর্শ তাহার ঠিক উল্টা। কাউন্ট ওকাকুরা নামক জাপানী ভাবুক তাঁহার Ideals of the East নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, ভাবের দিক হইতে সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশই—এক বারে এক "Asia is one"। তাই চীনা এবং জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করিলেই আমাদের প্রকৃত ভাবটি ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয় আমাদের আর্টের বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে এত দেরী হইতেছে। হ্যাভেল* সাহেব যখন আর্ট স্কুল হইতে বিদেশী ছবিগুলি বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ভারতীয় আর্টকে প্রথম স্থান দিলেন—তখন আমাদের দেশের সংবাদ পত্রের চীৎকারে তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভাবুকমাত্রেই বুঝিতেছেন কি শুভক্ষণেই হ্যাভেল সাহেব এদেশে আসিয়া আমাদের চোখে আঙুল দিয়া আমাদেরই ঘরের রত্ন চিনিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতার মত পাশ্চাত্য রমণীও দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় আর্টের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চিত্রকলার পুনর্জ্জন্ম হইল। সুদূর ফরাসী রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সে চিত্রকলা সমাদর লাভ করিল। কেবল আমাদের ঘরের বিজ্ঞ সমালোচকগণ মুখ ফিরিয়াও চাহিলেন না। বলিলেন—

কি আগুন লাগিয়ে দিলে ছবিতে
দেখে প্রাণে জাগে কবিতে
রং বিরং এর অগ্নি কণা
হাত দুটো ঠিক সাপের ফণা
মানুষটাকে যায় না চেনা
মৎস্য কন্যা কিম্বা নারী
সেইটে বোঝাই শক্ত ভারী ইত্যাদি।

এই সকল সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় চিত্রকলার মূল ভাবটি কি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমে বোঝা দরকার আর্টের আকারটাই সব নয়—ভাবটাই প্রধান। আমরা যখন কবিতায় পড়ি—

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুবলিত
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ইত্যাদি।

তখন যদি ভাবটি না ধরিয়া শুধু ভাষার কথায় কথায় ব্যাখ্যা করিয়া কবির বর্ণিত পুরুষকে ছবিতে আঁকি, তাহা হইলে চেহারাখানা কিরূপ

দাঁড়ায় মনে করুন তো! গলায় গলগণ্ড—তাহার উপর সুদীর্ঘ দাড়ি হইলে তবে সিংহগ্রীব হইবে, আর শুঁড়ের মত জানু হইতে হইলে Elephantiasis রোগের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই। পটল চেরা চোখ, এবং চাঁদের মত মুখ হইলেই তো সর্ব্বনাশ; অতখানি চোখ, ঐরূপ গোলাকার কলঙ্কযুক্ত মুখ—কে ভাল বলিবে জানি না! তাই শুধু ভাবটার ব্যঞ্জনামাত্র গ্রহণ করিতে হইবে—এ বিষয়ে কবিতাতেও যা, চিত্রেও কতকটা তাই।

ভারতের অন্তর্মুখী সভ্যতার আদর্শ অনুসারে বাহিরের আকারের প্রতি ভারতীয় চিত্রকলা তেমন নজর দেয় নাই। তাহার অর্থ এবং সার্থকতাও আছে।

অবনীন্দ্রনাথ একস্থলে বলিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্র আঁকিতে হইলে তিনি কলেজ স্কোয়ারের সেই আধখানা মাথা কামানো কাট খোট্টা আকৃতিটি আঁকিবেন না। দয়ার সাগর গুণের বারিধি পরদুঃখে বিগলিত প্রাণ একজন বাঙ্গালীর মূর্ত্তি ধ্যান করিলে তাঁহার মনে যেরূপ আসে তিনি সেইরূপ আঁকিবেন—তাতে সে আসল চেহারার সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক। এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা—শুনিয়া সকলে হয়তো অবাক হইবেন! কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় চিত্রকলা এই ভাবেই চলিয়াছে। দীর্ঘ ছয় বৎসরের কঠোর তপস্যা ও অনশনের পর শাক্যসিংহ যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন, ভারতীয় শিল্পী তাঁহাকে জ্ঞানের পূর্ণদীপ্তিতে ভাসমান এক সুডৌল সোণার আকৃতি প্রদান করিল। এই আকারের ভিতর তাঁহার ভিতরকার spiritual life এর পূর্ণতা প্রকাশ করিল। যাঁহারা বুদ্ধদেবের এই অবস্থার আকৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন কেমন সুন্দরভাবে ভিতরকার এই মস্ত

বড় জীবনটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার অভিব্যক্তি কি চমৎকার হইয়াছে! এই খানেই ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্য শিল্পী হইলে ছ'বৎসর উপবাস ও তপ সাধনার পর মানুষের ঠিক যেরূপ চেহারাটি হয় সেইরূপ আঁকিতেন। কিন্তু তার জন্য একজন ফটোগ্রাফার থাকিলেই চলিত। বুদ্ধদেবের প্রাণে কি পূর্ণতা আসিয়াছে শিল্পীকে ধ্যানবলে তাহা অনুভব করিতে হইবে এবং দ্রষ্টাকে ভক্তকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই তাহাকে বাহির ভুলাইয়াছে। আত্মাশক্তির মহাশক্তির প্রসার বুঝাইতে হইবে—শিল্পী অমনি দশদিকে তাঁহার দশখানি হাত সৃষ্টি করিয়া দিলেন। রাস্কিনের ন্যায় পণ্ডিতলোকেও ইহার অর্থ না বুঝিয়া ভারতীয় শিল্পকলাকে barbaric বলিবেন—কিন্তু ভারতবাসী আমরা আমাদের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন জিনিষকে না বুঝিয়া কেন যে তাহাদের সুরে সুর মিলাইতে যাই—তাহাই ভাবিয়া পাই না।

এ সম্বন্ধে ডাঃ কুমারস্বামী, হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি পড়িলেই সকলে কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবেন। রবিবর্ম্মার ছবির আদর দেশে চিত্রকলার সমাদর নাই ইহাই বুঝাইয়া দেয়।

আর্টের সমজ্‌দারি শিখার বিষয়। কাব্য বুঝিতে হইলে মনকে শিখাইতে হইবে, গান শুনিতে হইলে কানকে তৈয়ারী করিতে হইবে। চিত্র বুঝিতে হইলে চোখকে ঠিক ঠিক দেখাইতে হইবে, তবে সমজ্‌দারি সম্পূর্ণ হইবে। শুধু কতকগুলি পোষা ধারণায় মনকে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আর্ট ও জীবন

সৃষ্টির উপর মানুষের ওস্তাদির চেষ্টাতেই আর্টের সূত্রপাত। স্বভাবে যেটি যেমন আছে তাহা হয়তো আমাদের অভাব ঠিক ভালভাবে পূরণ করে না, কিম্বা সে ভাবে থাকিলে আমাদের মনঃপূত হয় না—তাই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিটুকু দিয়া তাহার উপর একটু কারিগরি চালাইতে যাই।

আর্ট যে শুধু মানুষেরই একচেটে তাহা নয়। প্রাণীদের মধ্যেও সুন্দর আর্ট দেখা যায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তফাৎটা এই যে, মানুষের আর্ট—ক্রমোন্নতিশীল, তাহার পরিবর্ত্তন নিত্যই হইতেছে—প্রাণীদের আর্ট প্রায় যেমন তেমনই আছে। আত্মরক্ষাহেতু চেষ্টা মানুষকে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, রাঁধিতে শিখাইল, কাপড় পরাইতে শিখাইল—আরও কত কি শিখাইল। এই সমস্ত আর্টের আবিষ্কর্ত্তা মহাপুরুষদিগের নাম পর্য্যন্ত মানব আজ ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় প্রয়োজনের সীমাতেই আর্ট আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং সৌন্দর্য্যবুদ্ধি আসিয়া প্রয়োজনকে ছাপাইয়া আর্টকে এক নূতন সাজ দিল। কাপড় দরকার—তাহার চারিধার শক্ত হওয়া দরকার—নানা রং-বেরংএর সূতা তৈয়ারি হইল—কত লতা পাতা ফুল জমির উপর বসানো হইল—পাড়ের কত রকম বাহার হইল—অবশেষে কাপড়ের চরম মসলিনে পরিণত হইয়া সে তাহার প্রথম উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তার কথাই ভুলিয়া গেল। তখন সেই সুন্দর মসলিনের নীচে আর একটা কিছু না পারিলে লজ্জারক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয় না! এমন কি অনেক সময় চীন-সুন্দরীর

জুতা-পরার ন্যায় ইহা একটা উৎপাতের আকারই ধারণ করিয়া বসে।

এই গেল material আর্টের কথা। ইংরেজীতে যাহাকে fine arts বলা হয় এইবার সেই চারু শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভাস্কর্য্য চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মূলে অনুকরণ প্রবৃত্তি, নিজের সৌন্দর্য্য অনুভূতির প্রকাশ ও ওস্তাদি দেখানোর চেষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সৃষ্টিতে যেটি আছে সেটি আমিও সৃষ্টি করিব—আমার যেটা ভাল লাগিয়াছে, সুন্দর মনে হইয়াছে—তাহাকে আমার আয়ত্তের ভিতর আনিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অমরত্ব দান করিব। যাহা দূর গগনের অসীম নীলিমায় লীন হইয়া আছে তাহাকে রং ও তুলিতে ধরিয়া ঘরের ভিতর বাঁধিয়া রাখিব, যাহা মরণের অজানা গভীরে ডুবিয়া যাইতেছে তাহাকে পাথরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিয়া নয়ন সম্মুখে ধরিয়া রাখিব। আমার মনে, আমার কল্পনাতে যাহা এত সুখ দুঃখের ঢেউ তুলিয়াছে তাহাকে ছন্দ ও গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিব—মানুষের চলিত ভাষাতে বিনা চেষ্টায় যে রূপটি মিষ্ট মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠে, আমি আমার অন্তরের কথা মরমের ব্যথা সমস্তটাকেই সেই মিষ্ট-মধুর ছন্দের তানলয়সংযোগে গাহিয়া শুনাইব—আমার নিভৃতের মরম কথা, জীবন নিশার গোপন স্বপনগুলি রঙীন হইয়া শব্দের হিল্লোলে, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অমর হইয়া মানুষের চির আদরের সামগ্রী হইবে।

যখন দেখিলাম মানুষ আমার সৃষ্টিতে ভুলিল, প্রকৃতির কোকিল-কণ্ঠের তান যখন মানবের মনপ্রাণ হরণ করিল, তখন আর্টের হারমোনিয়মের ভিতর দিয়া আমি সেই সুর, সেই পঞ্চম ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলাম। এইখানেই আর্টের প্রকৃত জন্মলাভ। ইংরেজীতে

art এবং artificial কথা দুইটি বুঝিলেই আর গোলমাল থাকিবে না। Art আর্টই Nature নয়।

এ আর্টের সহিত বাস্তব অনুভূতির সম্পর্ক সদাবদ্ধভাবে না থাকিতে পারে। তুমি সাবিত্রীর চরিত্রে মুগ্ধ হও—আমি স্বৈরিণী হইয়াও সেই চরিত্রের পালা অভিনয় করিয়া তোমায় মুগ্ধ করি। তুমি আমি কিছুক্ষণের মত এক কল্পলোকে চলিয়া যাই—আমি নানা আর্টের ভিতর দিয়া সাবিত্রীর ভাবটি তোমার সম্মুখে দেখাইতে চেষ্টা করি, তুমিও নিজেকে ও আমাকে ভুলিয়া, জীবনের বাস্তবের কথা স্মরণ না করিয়া —মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ভাবের ইঙ্গিতে নিজের মনকে নাচাইতে থাক।

তাই মনে হয় জীবনের সহিত খাঁটি আর্টের সম্পর্ক কতটুকু? যতটুকু অভিনয় ততটুকু মাত্র। স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিলেই কবি সত্যই যে খুব স্বদেশ প্রেমিক হইবেন এমন নয়, ভগবৎপ্রেমের কবিতা লিখিলেই কবি যে সত্যই ভক্ত হইবেন, একথা মনে করিলে অন্যায় হইবে। আমি যে রূপটি, যে চিত্রটি, যে কথাটি ভালবাসি, তিনি সেইটী বুঝিয়া আমার মনের সম্মুখে সেই নয়নমনোরম ভাবটি এমন করিয়া ধরিয়া দিতে জানেন যে তাহাতে আমি মুগ্ধ না হইয়া পারি না। বৃদ্ধা বেশ্যার কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা চোখের জলে ভাসিয়া যাই—অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রভাবে আমরা চটিয়া জুতা ছুড়িয়া মারি—এইখানেই আর্টের চরম সার্থকতা। চণ্ডীর গান গাহিয়া, আসরে গেরুয়া পরিয়া যে শ্রোতার মন হরণ করে—সে যে মায়ের অসাধারণ ভক্ত হইবে এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কবি ও কাব্যের ভাবের সঙ্গে ঐ ক্ষণিকের একতা—তবে তিনি কল্পনায় বা আর্টের সাহায্যে ক্ষণিকের জন্যও যতটা উঠিতে পারেন

আমি তাহা পারি না, তাই আমি কবি বলিয়া তাহাকে উচ্চাসন দিই, কিন্তু সাধক বলিয়া তাহাকে পূজা করিব না।

আর্টের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটি বুঝিলেই, অভিনয় ও সাধনার প্রভেদ বুঝিলেই আর গোলমাল থাকিবে না। আর্ট এবং জীবনের বিষয়ে এই তথ্যটুকু না বুঝিয়াই আমরা অলিতে-গলিতে ঋষির সৃষ্টি করি—নিজের সাধনা নাই, শক্তি নাই বলিয়া আদর্শটাকে এতই ছোট করিয়া ফেলি।

হালকা সাহিত্য

কি কুক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে নভেল লেখার পথ দেখাইয়াছিলেন—আর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অবতারণা করিয়াছিলেন ! বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর ওস্তাদের হাত ছিল—কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যগণ মক্‌স করিতে করিতে ব্যাপারটা এমন একটা বীভৎস করিয়া তুলিয়াছেন যে, এই শিব গড়িতে বানর গড়া বিষয়ে এখন দু'চার কথা না বলিলে চলে না।

স্বীকার করি, সাহিত্য কাহারও ফরমাস মত গড়িয়া উঠে না। শস্যের সঙ্গে আগাছাও অনেক জন্মিবে। সকল মুকুলেই ফল ধরিবে, তাহা নয়। গাছ ভরিয়া মুকুল আসিবে—ঝড়-বাদলে অনেক ঝরিয়া যাইবে—কতকগুলি কেবল প্রকৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফলরূপে সাফল্য লাভ করিবে। কিন্তু গাছের চেয়ে আগাছার বাহুল্য ঘটিলে আসল গাছটাই মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই আগাছা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। বাংলা সাহিত্যের তাই হইয়াছে। যে সাহিত্যের বয়স আজও শতাব্দী পার হয় নাই, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার সেদিন যাহার বীজ বপন করিলেন, ভাল বইএর সংখ্যা যেখানে আঙ্গুলে গণিয়াই শেষ করা যায়—সেখানে হালকা সাহিত্যের বৃদ্ধি দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। আমাদের সাহিত্য ঠিক যেন একটি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ছোট ছেলে—মাথাটি ছোট, গলাটি সরু, পেটটি মোটা—কুপথ্যে পেটজোড়া লিবারপিলে। পড়িতে গেলে দুদণ্ড ভাবিতে

হয়, কিংবা পড়ার পর মনে একটা আন্দোলন আনিয়া দেয়, বাঙলা সাহিত্যে এমন বই কয়খানা আছে? অবশ্য সব বই-ই যে এমন হইবে তাহা নয়। মানুষের আমোদের জন্য, ক্ষণিক সুখের জন্য একশ্রেণীর সাহিত্য চাই—কিন্তু সমগ্র সাহিত্যটাই সেই তরল সাহিত্যের প্লাবনে ভাসাইয়া দিলে তো চলিবে না।

বাংলাদেশে বিজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ লোকের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে—তাঁহারা সংসারের সব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। তাই বড় বড় বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া আর কি হইবে, এরূপ মনে করেন। অবশ্য পেটের চিন্তাই বাঙালীর মাথা খাইয়াছে। ডাঁটা চচ্চড়ি ও ভাত খাইয়া দিনরাত কলম পিষিয়া মানুষের প্রাণ একটু আরাম খুঁজিতে চায়। পয়সা থাকিলে এবং প্রবৃত্তি থাকিলে অনেকে এই আরামটুকু যে ভাবে উপলব্ধি করেন তাহা নাই বলিলাম; যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকেন, আর যাঁহারা অতটা জড় ন'ন, তাঁহারা তাস খেলিয়া অথবা নভেল ও গল্প পড়িয়া আড্ডা দিয়া অবসরটুকু কাটান। ছাত্রেরা বাপমার পয়সা ধ্বংস করিয়া এই সাহিত্যের লেখকদিগকে patronise করেন আর আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বাহ্য জগতের সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সকল নভেলের সাহায্যে বাহিরের লীলাখেলার আভাস গ্রহণ করেন।

কাজেই নভেল ও গল্পের পাঠক পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে বই কিনিয়া পড়ার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগ লোক চাহিয়া পড়েন, অনেক লোক ফেরৎ না দিবার উদ্দেশ্যেও চাহিয়া লইয়া পড়েন, কিন্তু কেনার লোক নাই বলিলেই হয়—বিশেষতঃ বইখানি যদি একটু উঁচু ধরণের হয় এবং তাহাতে ভাবিবার কথা কিছু থাকে।

উল্টো কথা

নভেল ও গল্পের আদরটাই খুব বেশী ; গ্রন্থকারগণ অনেক সময় পয়সার লোভে ঐ দিকেই ঝোঁকেন—তাতেই দেশে এত নভেল, এত গল্পের ছড়াছড়ি।

আমাদের রুদ্ধ সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্য নাই, পরাধীন জাতীয় জীবনে সমস্যা নাই, বিশ্বের সহিত যে যোগাযোগ তাহার সূত্রটি অন্যের হাতে—তাই আমাদের দেশে প্রাণবান সারবান সাহিত্য এখনো গড়িয়া উঠে নাই। সমাজ-জীবন যেমন হাল্‌কা, সাহিত্যও তেমনি হাল্‌কা। আর সবই একঘেয়ে। সেই থাড়া বড়ি থোড় এবং থোড় বড়ি থাড়া। ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই বাল-বিধবাকে লইয়া টানাটানি—তাহাকে প্রেমে ফেলিতেই হইবে কারণ সে যেন সমাজে ঐ কাজের জন্যই বেকার বসিয়া আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের মনের কত কলুষিত ভাব প্রকাশ পাইতেছে—জীবনে যাহার চরিতার্থতার সুবিধা নাই—বিফল প্রাণের সেই লালসাময় ঘৃণিত আশা-আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়া বাজারে চলিয়া যাইতেছে।

পতিতা নারীদিগের জন্য বাঙলা সাহিত্যিকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্য্যত উদ্ধার করিবার চেষ্টা বা সাহস নাই কেবল কলুষিত মনের খোরাক জোগাইবার জন্য এই সকল চরিত্রের অবতারণা। এক শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে আর কোনও সাহিত্যিকের নিকট তো এ সম্বন্ধে জীবনের একটা গভীর সহানুভূতি পাই না, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজাইতে গেলে তো চলিবে না।

একটা বাঁধা-ধরা উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিলে সে সাহিত্য প্রাণহীন হয়। সাহিত্য লোকশিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু তাহা গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া নয়, কিম্বা স্মৃতির বিধান দিয়া নয়। ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ

ও সাহিত্যিকের কাজ এক নয়। জীবনের গভীরতর সত্যগুলির সহিত আমাদের দৈনন্দিন কাজের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া নানারসের অবতারণা করিয়া মোলায়েম করিয়া সমাজকে শিক্ষা দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। মানুষের মনকে উঁচু দিকে লইতে চেষ্টা করাই দরকার—তাহাকে নরকের পথে আরও খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া মজা দেখা, আর বই বিক্রয় করিয়া পয়সা করা ভাল ব্যবসা নয়।

প্রকৃত সাহিত্যিক যে সমাজের মনের মত কথাই কহিবেন, তাহা নয়। প্রথমশ্রেণীর সাহিত্য প্রায়ই প্রথমে লোকে তারিফ করিতে পারে না। কিন্তু খাঁটী জিনিষের আদর জগতে হইবেই। সাহিত্যিকের সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজকে দিবার অনেক আছে। স্পেনের Cervantes, ও আমেরিকার Mark Twain এবং আমাদের দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসের ভিতর দিয়া কি অমৃতরসের সৃজন করিয়া গিয়াছেন। মিছরির ছুরি দিয়া সমাজদেহে যে অস্ত্রোপচার করিয়া গিয়াছেন—তাহার আর তুলনা নাই। হাল্‌কা সাহিত্য থাকুক, কিন্তু আর সব দিক ছাড়িয়া শুধু ঐটার দিকে সকলে না ঝুঁকিলেই দেশের কল্যাণ। যা-তা খাইয়া পিলে-লিবার-জোড়া পেটটি মোটা করিলেই চলিবে না—মাথাটাও যাহাতে বাড়ে এবং দেহের সুষমা ও সৌষ্ঠব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সাহিত্য-সাধকগণের সে চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে।

মরণ-লীলা

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা।
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষো ধর্ম্মঃ ॥

—কঠোপনিষৎ

আমাদের এই এক ছটাক বুদ্ধি ত্রৈরাশিক কষিয়া বলিয়া দিল—অমুক কাজটা অন্যায় হইয়াছে, এইরূপ হইলে ঠিক হইত। কিন্তু বিশ্ববিধাতা কি নিয়মে ত্রৈরাশিক করেন, তা বুঝিতে মহা মহা পণ্ডিতের বুদ্ধিও হার মানে। শ্লাভজাতীয় একজন যুবক অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের প্রাণসংহার করিল, তাহাতে বিশ্ব জুড়িয়া যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কোটি কোটি মানব পরিবারের হৃদয়-ভাঙ্গা অশ্রু-ধারার প্রবল স্রোতে সে আগুন নিবিল না—একজনের পাপে লক্ষজনের কেন এ শাস্তি, আমাদের ত্রৈরাশিক তাহা বলিয়া দিতে পারিল না। মস্ত একটা ঝড় আসিল—শিলাপাতে, বজ্রাঘাতে কত প্রাণহানি, কত নির্দ্দয় ক্ষতি সংসারের উপর নিমিষে আসিয়া পড়িল; আমাদের মধ্যে যাহার বুদ্ধি একটু কম সে বিধাতার নিন্দাবাদ করিল; যাহার খানিকটা বুদ্ধি আছে, সে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই চুপ করিয়া রহিল, আর যাহার দৃষ্টি আরও একটু সূক্ষ্ম সে এই সংসার-লীলার অন্তরালে মস্ত বড় একটা মঙ্গলের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তিভরে গাইয়া উঠিল—

"এই তো ঝঞ্ঝা তড়িত-জ্বালা,
এইতো দুখের অগ্নিমালা,
এইতো মুক্তি, এই দীপ্তি,

এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।"

বৈজ্ঞানিক আসিয়া বলিলেন—জীবন-মৃত্যু একগাছি শিকলের Link মাত্র—এ কেবল ঢেউএর ওঠা নামা।

"সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হ'য়ে গল্‌বে।
ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফলবে।"

ভক্ত আসিয়া বলিলেন—

"রোগ শোক দারিদ্র্য যাতনা ধর্ম্মাধর্ম্ম
শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা জীবে
বল কেবা কিবা করে।

উল্টো কথা

দার্শনিক ঋষি বলিলেন—

"ন জায়তে, ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো, নিত্যঃ, শাশ্বতোহয়ং, পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
—"আত্মা জ্ঞানময়, নাহি জনম, মরণ,
না হন উৎপন্ন, না করেন উৎপাদন
স্ব-রূপেতে সুগোচর
বর্ত্তমান নিরন্তর।
সদা কাল নব, নাহি বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়,
শরীরের ধ্বংসে তার ধ্বংস নাহি হয়।"

বিনাশ কোথায়? জগতে বিনাশ নাই।

"না সতো বিদ্যতে—ভাবো, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথা বলিয়াছেন। তবে আমরা বিনাশকে এত ভয় করি কেন? না চিরকাল হইতে ভাবিয়া আসিয়াছি—মরণের ব্যথা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

জানি, মরণের মত ধ্রুব এ সংসারে আর কিছুই নাই। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, আমি কৌপীন-মাত্র-সম্বল পথের ভিখারী—কিন্তু অন্তিমে তোমার জন্যও যে সাড়ে তিন হাত জমি, আমার জন্যও ঠিক তাই। কিন্তু আমরা সংসারে সর্ব্বদাই এমনভাবে চলি যেন আমাছাড়া আর সকলকেই মরিতে হইবে; আমি যেন সংসারে চিরদিন দেখিতে শুনিতে আর ভোগ করিতে আসিয়াছি। মরণকে বেশ ভয় করি, সময় সময় অপরকে মরিতেও বলি অন্ততঃ উপলক্ষ

বিশেষে মরিলে প্রশংসাও করি ; এমন কি, সাময়িক উত্তেজনা বশে কিম্বা তথা-কথিত একটা আদর্শের প্রেরণায় হয়তো নিজের বহুমূল্য প্রাণটাও বিসর্জ্জন দিয়া ফেলি।

মানুষ জরায় মরে ; রোগে মরে ; জড় বা চেতন কোনো প্রাকৃতিক শক্তির হাতে মরে ; সময় সময় নিজে নিজেও মরে—কখনো বা বাইরের ঠেলায়, কখনো বা অন্তরের প্রেরণায়। একটা লোক বুড়ো হইয়া মারা গেল, তাহার জন্য তত দুঃখ করিলাম না—বলিলাম—"নাতিপুতি রেখে বেশ গিয়েছে।"

একজন রোগে ভুগিয়া মরিল, মানুষের হাতে যা উপায় আছে তা প্রয়োগ করা গেল—ডাক্তারে বাঁচাইতে পারিল না—দুঃখ হইল, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, মনের এক কোণে এই তৃপ্তিটুকু জাগিয়া রহিল। বজ্রাঘাতে—ভূমিকম্পে মানুষ মরিল কষ্ট হইল—কিন্তু প্রকৃতির উপর হাত নাই—সহ্য করিতে হইল। নৌকা ডুবিয়া, রেলে চাপা পড়িয়া অথবা বাঘের মুখে কেহ মারা পড়িল—এতে দুঃখের মাত্রা কিছু বেশী হইল, কেননা ইহার প্রতিকার হয়তো অনেকটা আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই ছিল। তারপর একটা লোক নিজেকে নিজেই মারিল—বড় দুঃখ হইল—কেননা এ মরা, না মরাটা তাহার নিজের হাতেই ছিল। কিন্তু এই নিজের উপর হাতটা থাকিলে বোধ হয় কবির আক্ষেপের প্রতিকার গোড়াতেই হইয়া যাইত, তাহা হইলে কাঁদিয়া বলিতে হইত না—

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!"

আত্মরক্ষা হেতু সমাজ নির্দ্দেশ করিলেন—আত্মহত্যা মহাপাপ।

উল্টো কথা

আমরা ছেলেবেলা হইতে তাই শুনিয়া আসিতেছি—সুতরাং আমাদেরও বিশ্বাস আত্মহত্যা মাহপাপ। বিংশ শতাব্দীতে নরকের ভয় অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজকে তেমন বিচলিত করে না—তবুও সেই যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতার উপর গড়া এই বিশ্বাসটি অনেকের মনেই বেশ অচল অটল হইয়া আছে। আবার অসুখ হইল, তেমন যত্ন লইলাম না। বেশ অত্যাচার চালাইতে লাগিলাম—মরণের মুখে যাইতে হইল—এর নাম কি আত্মহত্যা নয়? হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, দুরাকাঙ্ক্ষা—"স্বদেশ প্রেম" নাম লইয়া লক্ষ নরের মুণ্ড চাহিল—আমরা স্বদেশিকতার দোহাই দিয়া তাজা মাথাগু'ল রাষ্ট্র-রাক্ষসীর হাড়কাঠে আগাইয়া দিলাম—জানিয়া শুনিয়া মরণের মুখে প্রবেশ করিলাম—দেশের লোক ধন্য ধন্য করিল, বলিল,—কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। এ আত্মত্যাগ আত্মহত্যার নামান্তর নয়? স্বামী মৃত—পতিই সতীর গতি—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক অবলাকে চিতায় ভস্মীভূত হইতে হইল—ঢাকের শব্দে মানবপ্রাণের আর্ত্তনাদ কোথায় ডুবিয়া গেল—লোকের কোলাহলে সতীর জয় জয় নাদে উৎপীড়িতের গভীর যাতনার কথা কেহ টেরও পাইল না! এই পুণ্যময় স্বর্গপ্রাপ্তি—বীভৎস নরহত্যা কিম্বা আত্মহত্যা নয়? তবে ধর্ম্মের নামে এই সব অনুষ্ঠান হওয়ায় ইহাতে নরহন্তার ফাঁসি নাই! কিম্বা আত্মহত্যাকারীর নিন্দা নাই? কিন্তু বিশ্বের বিধাতা যিনি তাঁহার চক্ষুতো চিতা-ধূমে রুদ্ধদৃষ্টি হয় নাই!

তবে একটা কথা আছে—স্থল বিশেষে আমরা মানুষের মরণের—স্বকৃত অথবা পরকৃত—প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না—আমরা এমনই সংস্কারবদ্ধ জীব। মাতার ধর্ম্মনাশে উদ্যত—দুর্বৃত্তের

বিনাশকারী পুত্রকে আমরা সাধুবাদই করিয়া থাকি—যদি সে নরহন্তা বই আর কেহই নয়। আমরা সংস্কারবশে অথবা স্বার্থের প্রেরণায় যে আদর্শকে মহান বলিয়া প্রচার করি—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক তাহার জন্য লোকে প্রাণদান করিলে জয় জয়কার করি—এমন কি ধর্ম্মের নামে অথবা আইনের বলে মানুষকে মারিবার জন্য নিযুক্ত করিতেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হই না। ধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টশিষ্য নিজের ভাই মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে—এক হাতে কৃপাণ—আর এক হাতে ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিয়া প্রাণের বিনিময়-মূল্য জগতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—স্বদেশ-প্রেমের নামে দেশে দেশে "কনস্ক্রিপসন" আইন জারি করিয়া মানুষ মানুষকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরমেধ যজ্ঞের হোতা করিয়াছে। রাজপুত-রমণী চিতায় প্রবেশ করিয়াছে—সাধু প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—আমরা ধন্য ধন্য করিয়াছি সেটা আমাদের সংস্কার অনুযায়ী হইয়াছে।

পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—জীবনের সুখ দুঃখের একমাত্র উৎস অভাবে আজ সতীর প্রাণ প্রবাহিনী শুষ্কপ্রায়, দেহে চৈতন্য রহিল না—পতির অবলম্বিত সেই অজানা পথে প্রাণ-পাখী উড়িয়া গেল। সংসারের বিজ্ঞ হিসাব-বুদ্ধি দাড়ি নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা, বেঁচে থাকলে মেয়েটির দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের কত উপকার হতো, হতভাগিনী নিজের এই দুঃখটুকু পরের মুখ চেয়ে সয়ে থাকতে পারল না!" সঙ্গে সঙ্গে সংসারের এই বিজ্ঞবুদ্ধির রায়ে শাস্ত্র আসিয়া সায় দিয়া এই ধারণাটাকে খুবই পাকা করিয়া দিল। কিন্তু সৃষ্টি-ছাড়া একটা হিসাব-ভোলা-ক্ষ্যাপা কোথা হইতে আসিয়া বলিয়া গেল—"হায়, নিষ্ঠুর স্বার্থময় সংসার, কেবল নিজের সুখের কথাটাই ভাব্‌লে; কে বলেছে ও বেঁচে থাকলে তোমাদের

আশা পূর্ণ হতো, ও পাগল হয়ে গিয়ে হয়তো সারা জীবন নিজেও দারুণ দুঃখ পেতো, আবার সংসারেরও মহাদুঃখের কারণ হয়ে থাকতো। আমার প্রভু, জগতের প্রভু ভোলানাথ মহেশ্বরই এ হিসাব জানেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিতেই কাজ করেন—তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তার কি বুঝবে বল? "মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ—জীবন রমণ লীলার ভিতর দিয়ে রুদ্র এই কথাই যে অহরহ তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন।"

আমরা হিসাব করিয়া দেখি প্রেমাবতার খৃষ্ট ছয়মাস ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বারো জন শিষ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি জানিয়া শুনিয়া নিতান্ত বোকার মত অল্প বয়সে নিজের অমূল্য জীবনটা বিসর্জ্জন দিলেন—আহা অমন লোক যদি আর বিশ পঁচিশ বৎসর বাঁচতেন, না জানি তাহা হইলে কিনা করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু ঐ নিরীহ লোকটি না মরিয়া যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ত্রৈরাশিকের নিয়ম অনুসারে ছয়মাসে বারোজন হিসাবে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে কয়টি শিষ্য পাইতেন; প্রাণদান করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রভাবে আজ তিনি তাহার কোটিগুণ শিষ্যলাভ করিয়াছেন—মৃত্যু দিয়াই তিনি প্রাণকে পাইয়াছেন—

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ।
সেইত—তোমার প্রাণ।"

জার্ম্মাণ অধ্যাপক পণ্ডিতরত্ন হিকেলের কথায় বলি—"যদি জীবনে আমার কোনো জিনিসে অধিকার থাকে, তবে সে আমার নিজের প্রাণ এবং তার যদিচ্ছা ব্যবহার।" অবশ্য ইহার দ্বারা আমি সমাজের পক্ষে

অনিষ্টকর সচরাচর যে সব আত্মহত্যা হয় তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি না।

ক্ষুধার জ্বালায়, ক্রোধের বশে, লোকলজ্জায় কতজন আত্মহত্যা করিতেছে—সেগুলির নিবারণ সমাজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব—সমাজের বিচারবুদ্ধিতে যাহা মঙ্গলজনক সেই জীবন রক্ষা ব্যাপারটা একান্ত আবশ্যক। তাই সমাজ ব্যক্তির নিজের জীবনের ঐ যদিচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতার উপর হাত দিতে চায়, তাই আত্মহত্যার এত নিন্দা। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা ভাল মন্দ আছে, মানুষ খুন করাও যেমন সময় সময় সমাজে সমর্থিত হয়—যেমন মাতায় ধর্ম্মনাশকারীর প্রাণবধ!

নিরুপায় পিতামাতাকে সমাজের নিন্দা-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কুমারী স্নেহলতা যখন সেই পোড়া সমাজেরই নৃশংস পণ-প্রথার সমীপে আত্ম-বলিদান করিল তখন বিজ্ঞ-সামাজিকগণ শাসনদণ্ড লইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিলেন। ব্যক্তির এই উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের ভাল লাগিল না। কিন্তু হে জরাজীর্ণ, নিষ্ঠুর সমাজ, যে পাপ পদ্ধতির জন্য আজ এই স্নেহের পুতলীটি—বাপ মার কোল শূন্য করিয়া মরণের পথে চলিয়া গেল—সে নারকীয় প্রথা তুমিই না প্রচলিত রাখিয়াছ—কুমারীর প্রাণবলি পাইয়াও তো কই তোমার চৈতন্য হইল না!

তাই আজ বঙ্গের শত শত ঘর অন্ধকার করিয়া দলে দলে কুমারীগণ সমাজের এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সব স্নেহের ডোর ছিন্ন করিয়া যমের কবলে অগ্রসর হইতেছে—তুমি শুধু বসিয়া নিন্দাই করিতেছ; সমালোচনাই করিতেছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার প্রতিকার কিছু

করিয়াছ কি? যতদিন তাহা না করিবে এই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে—কেহ ঠেকাইতে পারিবে না, ঘরে বসিয়া তোমার চোখরাঙানির দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিবে না—কাজে কিছু না করিয়া সমালোচনা করিলে কি হইবে?

নিজের প্রাণটার শেষ নিজে করা যত সহজ মনে করা যায়, তত নয়। সংসারে অনাহারে, রোগে শোকে মানুষ নিয়ত কত কষ্টই তো পাইতেছে, মুখে কতবার মৃত্যু কামনা করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক মৃত্যুর ছায়া দেখিলেই—তখনই জীর্ণ প্রাণের শীর্ণ অবশেষটুকুকে কত আশাভরে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতেছে যেন তাহাকে কোনোদিন মরিতে হইবে না! আজ যদি শাহাজানের মত কোনও সম্রাট আসিয়া বলেন "সংসারে কে আছ এস, তোমার জীয়ন্ত সমাধির উপর তাজ গেঁথে দেবো"—কয়জন অগ্রসর হইতে পারিবে, বল তো?

অশীতিপর বৃদ্ধার নয়নের মণি একমাত্র গুণবান পুত্র কথা কহিতে কহিতে মরিয়া গেল—কই সে তো প্রাণ বিসর্জ্জন করিল না! ষোড়শী যুবতীর জীবনের আশা আহ্লাদে আগুন দিয়া প্রাণাধিক পতি কোন্ অজানা দেশে প্রস্থান করিল—কই তাহার তো প্রাণ বাহির হইয়া গেল না! পিতা থাকিতে পুত্র মরিতেছে, বন্ধু থাকিতে বন্ধু যাইতেছে কিন্তু সংসারের এই নিষ্ঠুর মরণ-লীলার মাঝে কে কাহার সঙ্গী হইতেছে বল?

একটি বালকের সন্ন্যাসে মতি হয়—তাহাতে সকলে তাহাকে উপদেশ দেন "বাবা, সবই যদি সংসার ধর্ম্ম না ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে থাকে, তাহলে বিধাতার সৃষ্টিরক্ষা কিসে হবে বল?" বালক উত্তর করিল "সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে এমন শুভ দিন যে আসবে না সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে যদিই বা কোন দিন তাই হয়, তাহলে

যিনি এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা সৃষ্টি করেছেন, কোটি বিশ্বের প্রলয় স্থিতি যাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরন্তর সংঘটিত হচ্ছে তিনিই তাঁর রচিত সৃষ্টির একটা কিছু উপায় করতে পারবেন, এ বিশ্বাসটুকু আমাদের থাকা উচিত।"

প্রাণ বিসর্জ্জন ব্যাপারেও তাই। অমুক এই অবস্থায় নিজের প্রাণটা শেষ করিয়াছে—তাহার সেই মরণের জন্য যদি সাধুবাদ করি, অমনি হাজার হাজার লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবে—এই ধারণা যাহার সামান্য একটু আছে, সে-ও পোষণ করিবে না। অপর একজনের উদ্দেশে প্রাণ দিতে পারে এমন হৃদয়ের যোগাযোগ সংসারে দুর্লভ—যদি একটি ঘটনা সেইরূপই হয়, তবে তাহা আমাদের স্বার্থ-নীচতা কলুষিত ধরাকে পবিত্র বই অপবিত্র করিবে না।

"বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয়না পড়ে কোনো লাভের আশে,—
যাবার লাগি মন তারি উদাসে
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া ;
পথে চলা সেইত তোমায় পাওয়া।"

পতির জন্য সতীর স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগের হেতু আদর্শ প্রেমিক ভিন্ন কে আর বুঝিবে? যাহার ব্যথা সেই জানে যে, তাহার ব্যথার ব্যথী সেও কতক জানে, যে গিয়াছে সে যে কত কষ্ট, কত বেদনা পাইয়া তবে নিজের এই অমূল্য জীবনটা হেলায় বিসর্জ্জন করিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে?

সে মৃত্যুকে মৃত্যুহীনের অপরূপ সাজে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। শরীরের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, সংসারের মস্ত মস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা

তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইয়াছে—স্বর্গীয় প্রেমের অমিয় মাধুরী তাহাকে মরণের দারুণ যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়াছে। সে প্রবাসী পথিকের মত অনন্তের অনন্ত পথে যাত্রী হইয়া জীবন দেবতার উদ্দেশে নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—মরণের পরপারে অমর হইয়া সংসারের নীচতা, মলিনতা ভুলিয়া গিয়া সত্যশিব সুন্দরের রুদ্রলীলার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

"যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর মাঝখানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু—তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার কাটা সেই জানে
ভবসাগর মাঝখানে।
রক্ত যে তার মেতে ওঠে—মহাসাগর কল্লোলে
ওঠাপড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউএর সাথে ঢেউ তোলে।
অরুণ আলোর আশিস্ লয়ে
অস্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে—যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর মাঝখানে।"
